দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসব ও গাজন লোকনাট্য: বিষয়, আঙ্গিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে

পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ

গবেষক

প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার A00CL 1200816 (2016-2017)

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা– ৭০০০৩২

২০২৩

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসব ও গাজন লোকনাট্য: বিষয়, আঙ্গিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে
পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ

গবেষক

প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুজিত কুমার মণ্ডল
তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা– ৭০০০৩২

২০২৩

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসব ও গাজন লোকনাট্য: বিষয়, আঙ্গিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণাংশে নদ-নদী, সমুদ্রের পলি সঞ্চয়ের ফলে অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ গড়ে উঠেছে যা নিয়ে সুন্দরবনাঞ্চল গঠিত হয়েছে। সুন্দরবনাঞ্চলের অন্তর্গত সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘী, জয়নগর, কুলতলি, বাসন্তী ও গোসাবা মোট ১১টি থানা নিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা গড়ে উঠেছে। এই জেলার ভূমি সন্তান হিসেবে যেমন আছেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখরা তেমনি রয়েছেন পৌণ্ড্র, ক্ষত্রিয়, হাড়ি, ডোম, বাগদী, চণ্ডাল, তিয়র, রাজবংশী, কৈবর্ত প্রভৃতি তথাকথিত শূদ্ররা। এছাড়া অষ্ট্রিক বা আদিম মানবজাতির কিছু বংশধর ছিল আর ছিল মূলত গঙ্গারিডি জাতি। এই জাতিই হল এখানকার প্রাচীন জনগোষ্ঠী। এদের মূল অংশ 'পুণ্ড্রবর্ধনীয়'রা প্রাচীন পৌণ্ড্রদেশ থেকে আগত বিভিন্ন ক্ষত্রিয় জাতি। তপসিলভুক্ত জাতির মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের পরিমাণই সর্বাধিক। যারা প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ্যপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে পিছিয়ে গিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরকূলে শ্বাপদ সংকুলিত অরণ্যভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং ক্রমশ একটি বসতিপূর্ণ রাজ্য গড়ে তোলে যা বর্তমানে এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বলা যেতে পারে। আসলে যে সমস্ত মানুষেরা এখানে বসতি গড়ে তুলেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই ছিলেন পাশ্ববর্তী অঞ্চলের তপসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষ। বর্তমানেও এই অঞ্চলের প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ এই শ্রেণিভুক্ত। এই তপসিলি জাতি ও উপজাতির মধ্যে অধিকাংশ মানুষই পোদ বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। এছাড়াও এই অঞ্চলে বাস করেন কাওড়া, বাগদি, নমঃশূদ্র, ধোবি, রাজবংশী, কৈবর্ত, মাহিষ্য প্রভৃতি। পেশাগত দিক থেকে এরা প্রায় সকলেই মূলত কৃষিজীবী।

ইতিহাসের দিকে দিক্‌পাত করলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের জীবনযাত্রার যে চিত্র আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তা হল এখানকার নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষের কঠোর সংগ্রাম চিত্র। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণে সুন্দরবনাঞ্চল অবস্থিত হওয়ায় ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়,

নদীবহুল এলাকার নদ-নদীর জলোচ্ছ্বাস, নদীর মজে যাওয়া, শ্বাপদ সঙ্কুলতা, নদীর অনবরত গতি পরিবর্তন, বিপদসঙ্কুল পরিবেশ, ভূমিকম্প—এ সব ছিল এখানে জনবসতি গড়ে ওঠার অন্তরায়। বিপর্যস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দ্রব্য সম্ভারের স্বল্পতা, এই মানুষগুলির অর্থনৈতিক পরিবেশকেও এক অনিশ্চয়তায় ঘিরে রেখেছিল। তার সাথে ছিল রোগ, ব্যাধি, অকালমৃত্যুর মতো নানাবিধ সংশয়পূর্ণ বিপর্যয়। অসহায় দরিদ্র এই মানুষগুলির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি সৃষ্টি করেছিল উদ্বেগ, সংশয় ও আশঙ্কা। তার সাথে ছিল দিন-রাত্রি, ঋতুপরিবর্তন, জন্ম-মৃত্যু, নিদ্রা ও স্বপ্নের বিকাশ ও অন্যান্য ঘটনাবলির বিচিত্র সমাবেশ। যা এই সকল নিম্নবর্গীয় দরিদ্র মানুষগুলির মনের মণিকোঠায় বহু অযৌক্তিক বিশ্বাসের অতিপ্রাকৃত বা অশরীরী শক্তি কল্পনার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। গ্রাম্য, নিরক্ষর, অজ্ঞ, দরিদ্র এই মানুষগুলি যুক্তির যথাযথ কারণ অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে এই সকল শক্তিসমূহের ধ্যান-ধারণায় বা তুষ্টি সাধনায় সমবেত হয়েছিল। তারা চেয়েছিল এক নিরুদ্বেগ, নিশ্চয়তাপূর্ণ জীবন। তারা আস্থা রেখে ছিল লৌকিক দেব-দেবীর উপর। আর সেই সমস্ত লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে তারা পেয়েছিল নিশ্চয়তাপূর্ণ জীবনের প্রাথমিক সন্ধানের আশ্বাস। ধর্মীয় উৎসবই হল অসহায় দরিদ্র এই মানুষগুলির জীবন সংগ্রামের কালজয়ী ঘটনার বাঙ্ময় মূর্ছনা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় কৃষিসমাজে গাজন উৎসব হল সেই রকমই একটি ধর্মীয় উৎসব। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গাজন উৎসব পালন হয় দু'ধরনের—শিবের গাজন ও ধর্মের গাজন। শিবের গাজন শিবঠাকুরকেন্দ্রিক ও ধর্মের গাজন ধর্মঠাকুরকেন্দ্রিক। শিব ঠাকুরের পাশাপাশি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ধর্মঠাকুরের পুজোর প্রচলন রয়েছে। তাই এখানে শিবগাজনের পাশাপাশি ধর্মের গাজনেরও চল রয়েছে। তবে শিবের গাজনের কাছে ধর্মের গাজন অনেকটাই নিষ্প্রভ। এই অঞ্চলে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের কাছে শিব হয়ে উঠেছে ঘরের মানুষ। মন্দিরের পাশাপাশি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই অঞ্চলে শিবকেন্দ্রিক বেশ কিছু 'দোল' বা 'দেউলে'র অস্তিত্ব রয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় এই মানুষগুলির কাছে শিবের হলধর রূপটিই বেশি জনপ্রিয়। তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় কৃষিসমাজে গাজন উৎসব হল শিবকেন্দ্রিক একটি ধর্মীয় উৎসব। যেখানে কঠোর বাস্তব ও সংগ্রামে ঘেরা পরিবেশের বাইরে মানুষের বুদ্ধির অনতিগম্য, অতিপ্রাকৃত জগতের বিভিন্ন শক্তিসমূহের সন্তুষ্টি সাধনের মাধ্যমে পার্থিব সম্পদের অধিকারী হওয়ার এক সুকৌশল প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি ঘটত। বহু বছর

ধরে এই প্রচেষ্টায় মানুষ নানা ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। প্রতি বছর সমবেত ভাবে কয়েকদিনব্যাপী আচরণ পালনের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা ও গোষ্ঠী চেতনার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তারা আত্মার নিবিড়তায় পরস্পরকে আবদ্ধ করে তুলতো।

প্রথম অধ্যায়: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকদেবতা শিব এবং ধর্মঠাকুর

নানান ধর্মীয় আচার-রীতি সম্বলিত চারদিনব্যাপী গাজন উৎসবের শেষদিন রাত্রে সারারাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠিত হত মনোরঞ্জনমূলক নাচ, গান, সংলাপ সমৃদ্ধ গাজনপালা অভিনয়। এই গাজনপালা অভিনয় ছিল গ্রামের মানুষের কাছে অন্যতম বিনোদনের অঙ্গ। আসলে গ্রাম জীবনে ছিল বিনোদনের অভাব। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় এই মানুষগুলির জীবনে বিনোদনের জন্য ব্যয় করার মতো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যেরও অভাব ছিল যথেষ্ট। চৈত্র মাসের শুরুতে গ্রামের অধিবাসীগণ নিজেদের মধ্যে থেকে অভিনেতা, বাদ্যকার, নির্বাচন করে দল তৈরি করত। সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসী বহির্ভূত মানুষ সকলেই এতে অংশগ্রহণ করত। এরপর গ্রামেরই কারও বাড়িতে বা নাটমন্দিরে একমাস ধরে চলত গাজনপালার মহড়া। গাজন উৎসবের শেষ দিনে হত পালা অভিনয়। গাজন উৎসবের এই গাজনপালা নামক লোকনাট্যটি ছিল গ্রামের মানুষের শিল্পচর্চার অন্যতম একটি মাধ্যম। গ্রামেরই অনেক প্রতিভাবান শিল্পী কেবলমাত্র জীবনের তাগিদে ও সুযোগের অভাবে শিল্পচর্চার সময় ও সুযোগ পেত না। তাদের কাছে গাজনপালা ছিল শিল্পচর্চার এক বিশেষ মাধ্যম। ক্রমে ক্রমে গাজন উৎসব থেকে আলাদা হয়ে গাজনপালা লোকনাট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্থানে স্থানে তৈরি হয় গাজনদল। দিনবদলের সাথে জনপ্রিয়তা বর্ধিত হওয়ায় গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত গাজনদল গড়ে ওঠে একসময় তাতে যুক্ত হয়েছে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। রূপ নিয়েছে পেশাদারি গাজনদলের। বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অসংখ্য পেশাদারি গাজনদল গড়ে উঠেছে ও তাদের কার্যালয় (গদিঘর) নির্মিত হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভটির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চলরূপে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। ধর্মীয় গাজন উৎসব বিষয়ে জয়নগর ও লক্ষীকান্তপুর

অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে এবং লোকনাট্যরূপ গাজনপালা বিষয়ে কাকদ্বীপ ও লক্ষ্মীকান্তপুর অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা যথা—রাজারামঘাট, রঘুনাথপুর, রায়পুর, শামপুর, কামারহাটি প্রভৃতি এলাকাসহ শহরতলি ও শহরের কিছু এলাকা যেমন—হোটর, মগরাহাট, বারুইপুর, নরেন্দ্রপুর, সোনারপুর, ছিটকালিকাপুর, উল্টোডাঙ্গা প্রভৃতি এলাকায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে। নানান তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি গাজনপালা দলগুলির শিল্পী, অভিনেতা, কর্মী, তত্ত্বাবধায়ক, আহ্বায়ক প্রমুখ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শিবগাজন ও ধর্মগাজন উৎসব: প্রাথমিক পরিচিতি ও সামাজিক তাৎপর্য

যুগ যুগ ধরে সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিশেষত সুন্দরবনাঞ্চলের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির নিম্নবর্গীয় দরিদ্র কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষগুলির জীবনকে লৌকিক দেব-দেবী প্রভাবিত করেছিলেন। শিব হয়ে উঠেছিলেন তাদের ঘরের দেবতা। তাই সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব্যাপী অগণিত শিবমন্দির আর শিবের থান গড়ে উঠেছে। শিব এই মানুষগুলির জীবনে হলধররূপে অবির্ভূত হয়েছেন। এখানকার অধিকাংশ জায়গায় লিঙ্গরূপী শিব পূজিত হন। শিব ও শিবানীর অভিন্নতা রূপের প্রকাশ এটি। শিব সৃষ্টির দেবতা, সংহারের দেবতা, উৎপাদন ও প্রজননের প্রতীক এবং শিবানী বসুমাতা ধরিত্রী, যেখানে উৎপাদন হয়। দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সুন্দরবনাঞ্চল অধ্যুষিত বিশেষত কৃষিনির্ভর দরিদ্র মানুষগুলির জীবনে শিবকেন্দ্রিক গাজন নামক শস্য উৎসবটি ছিল চৈত্র মাসে পুরাতন বছরের শেষ ও নতুন বছরের প্রারম্ভের সন্ধিক্ষণে আগত বছরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য কামনার উৎসব। এই উৎসবটিকে মনে করা হত শিব-পাবর্তীর বিবাহ উৎসব। সেখানে শিবভক্ত সন্ন্যাসীর দল অনুগামী বরযাত্রী। চারদিনব্যাপী নানান আচরণ পালনের সাথে সাথে শিব মাহাত্ম্যসূচক ধ্বনি ও গান করা হয় এই উৎসবে। গাজন আদিম একটি উৎসব। অন্ধবিশ্বাস, সংশয়, উদ্বেগ থেকে এখানকার আদিম অধিবাসীগণ আস্থা রেখেছিলেন লৌকিক দেব-দেবীর উপর। তাই লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক এই উৎসবের মধ্যে নিহিত থাকে আদিম

সংস্কার। চৈত্রমাসের শেষে চারদিনব্যাপী গাজন উৎসবের উন্মাদনায় একসময় সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামিণ হিন্দু এলাকাগুলি উদ্বেলিত হয়ে উঠত। ২৬শে চৈত্র স্নানের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ভক্তরা। ২৭শে চৈত্র থেকে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত নানান আচরণ, রীতি-নীতি পালন করা হয়। শেষ দিন রাত্রে সারারাত ধরে চলে গাজনপালাগান। নাচ, গান, বাজনা, হাসি, তামাশা, সমৃদ্ধ সংলাপধর্মী কাহিনি অনুষ্ঠান। যা এক আনন্দ বিনোদনের উপাদান। পয়লা বৈশাখের দিন উত্তরীয় কেটে পুকুরের মাটিতে স্থাপিত করে, স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরিধান করে আমিষ আহারের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসেন নিজ গোত্রে। সম্পন্ন হয় গাজন উৎসবের। কৃষি নির্ভরশীল মানুষগুলির সারা বছরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করত শস্য উৎপাদনের উপর। তাই নতুন বছরের সূচনায় পালিত হওয়া শস্য উৎসবের সাথে মিশে থাকত এই মানুষগুলির ভক্তি ও নিষ্ঠা।

গাজন উৎসবের শেষ পর্যায় হল চড়ক। অনেকে ‘চড়ক পুজো’ও বলেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক হয়। কারও মতে শ্রীকৃষ্ণের সাথে বাণরাজার যুদ্ধের সময় শিবকে তুষ্ট করার জন্য বাণ রাজার আত্মনিগ্রহ থেকেই চড়কের উৎপত্তি হয়েছে। সঙের সাথেও গাজনের সম্পর্ক নিবিড়। চৈত্র বাংলার শিব-গাজনে গঙ্গাস্নানের সময় গ্রামবাসী শিব-পার্বতীর বিবাহে শিব-পার্বতী, নন্দী-ভৃঙ্গী, ভূত-প্রেত, পশু-পাখি প্রভৃতি সেজে ঢাক-কাঁসি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে এবং তার সাথে নৃত্য করতে করতে সঙযাত্রা বা শোভাযাত্রা বার করে। এই শোভাযাত্রাটিকে একপ্রকার বীরত্বব্যঞ্জক উন্মাদনার অভিব্যক্তি বলা যায়। ঊনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত কলকাতা শহরের বিভিন্ন পল্লীতে-পল্লীতে চৈত্রসংক্রান্তির আগে থেকে রাস্তায়-রাস্তায় সঙ বের হতো। এই সঙেরা নাচ, গান ও ছড়ার মাধ্যমে অভিনয় করত। সঙের মিছিলে রঙ্গ, ব্যঙ্গমূলক ছোট ছোট নাটিকা অভিনয় করা হত। বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা, সামাজিক নানান অসঙ্গতি, দুর্নীতির প্রতি কটাক্ষপাত ও নানান সামাজিক চিন্তাভাবনা প্রভৃতি বিষয়ক গানগুলি এতে প্রকাশ পেতো।

গাজন যুগ যুগ ধরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের জীবনে কেবলমাত্র একটা ধর্মীয় উৎসবরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেনি এখানকার মানুষের জীবনকে নানান ভাবে প্রভাবিত করেছে। সাহিত্য থেকে পেশা সর্বত্রই তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গাজন বিষয়কে অবলম্বন করে গ্রামে-গঞ্জে বহু ছড়া তৈরি হয়। স্বল্পশিক্ষিত রচয়িতার দ্বারা রচিত, কোনোটার লিখিত উল্লেখ থাকে আবার কোনোটা

মুখে মুখেই রচিত ও প্রচারিত থেকে যায়। গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে গানের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। যথা- শিব-পার্বতীর বিবাহকেন্দ্রিক গান, গাজন উৎসবের বিভিন্ন আচারের সময় গাওয়া হয় এমন শিব-পার্বতীর গান এবং গাজনের মনোরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে গাওয়া হয় এমন গান। গাজনের গানে থাকে শিব-পার্বতীর প্রাধান্য বেশি। তবে অন্যান্য দেব-দেবীর বন্দনা গানও এতে থাকে। পৌরাণিক আঙ্গিক থেকে বেরিয়ে এসে লৌকিক রূপের আঙ্গিকেও দেব-দেবীকে কখনো উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক প্রভৃতি দিকগুলিও কখনো সরাসরি আবার কখনো রূপকের আঙ্গিকে চিত্রিত হয়ে ওঠে গাজন গানে। কখনো সাম্প্রতিক ঘটনাও অবলম্বন করে গান রচনা করা হয়। গাজনকারেরা নিজেদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে গাজনের গানের বিষয়বস্তু করে রূপায়িত করেছেন। তাই লোকজীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনা পরিস্ফুটন ঘটে এখানকার গাজনগানে। বাংলার মানুষের জীবনে গাজন উৎসব এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে সময়ে সময়ে তা নানান প্রচলিত কথা বা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। কোন কোন প্রবাদের সৃষ্টিকর্তা কখনো বিখ্যাত লেখকও। গাজন ও চড়ক উৎসবের বিভিন্ন বিষয় ক্রমশ পেশায় রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে হাওড়া অঞ্চলে গড়ে ওঠা অসংখ্য সংস্থা পেশাদারি সঙ হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। গাজন উৎসবের পিঠফোঁড় বিষয়টিও পেশায় রূপান্তরিত হয়েছে। পিঠফোঁড়েরা শিবের গাজনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এরা সন্ন্যাসীদের মতো রীতি-নীতি পালন করে না। সময়ের সাথে সাথে গাজনপালা পরিবেশন বিষয়টিও একটি পেশায় রুপান্তরিত হয়েছে। পূর্বে গ্রামের মানুষজনকে নিয়ে তৈরি হত গাজনদল। তাদের মধ্যে থেকেই হতেন বাদ্যকার থেকে অভিনেতা। দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায় হত মহড়া। চৈত্র মাসে অনুষ্টিত হত এই গাজনপালা। দিনবদলের সাথে সাথে পরিবর্তন আসে। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হয় ছোট ছোট গাজন সংস্থা। ক্রমে তৈরি হয় পেশাদারি গাজনদল ও গদিঘর। কাকদ্বীপ, কামারহাট, কুলতলি, রামগঙ্গা, ঘটুগঞ্জ, জয়নগর, ঘটিহারানিয়া প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর পেশাদারি গাজনদল গড়ে উঠেছে। এরা নিজেদের গ্রামে তো বটেই আশে পাশের গ্রামেও এমনকি নিজের জেলা ছেড়ে অন্য জেলাতেও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অভিনয় করে। দলগুলিতে থাকেন কলাকুশলী, বাদ্যকার, আলো ও শব্দ নিয়ন্ত্রক, দলমালিক, রাঁধুনিসহ গাড়িচালকও। বর্তমানে রয়েছেন পেশাদার পালাকার, ‘গাজন মাষ্টার’, নির্দেশক, প্রশিক্ষক। রয়েছে প্রচার ব্যবস্থা- বিজ্ঞাপন, প্রচার, ব্যানার, লিফলেট প্রভৃতি।

দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে বিশেষত শিব-পার্বতীকেন্দ্রিক বা কোন পৌরাণিক কাহিনিকে কেন্দ্র করে গাজনপালা রচিত হওয়ায় এর একদিকে রয়েছে ধর্মভাবনা অন্য দিকে রয়েছে বিনোদন। এছাড়া সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম মাধ্যমও বটে আবার জনমানস গঠনের পাশাপাশি হয় উন্নয়নমূলক কাজও। এছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা গঠন ও নীতিমূলক শিক্ষাদান করা হয় এই পালার মাধ্যমে। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরীতেও যেমন গাজনপালাগুলির অবদান রয়েছে তেমনি গ্রাম সমাজ গঠন ও উন্নয়নেও তার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা লোকনাট্য ও গাজনপালা: বিষয় বৈচিত্র্য ও কালান্তর

বিশিষ্টজনের মতামত থেকে ‘লোকনাট্য’ বলতে বোঝা যায়- গ্রামিণ লোকসমাজ দ্বারা লোকভাষায় সহজ, সরল ভাবে মুখে মুখে প্রচারিত বা লিখিত এবং গ্রামিণ শ্রমজীবী, দরিদ্র, কৃষিজীবী মানুষগুলি দ্বারা অভিনীত হয়ে গ্রামের মানুষগুলির সামনেই নৃত্য-গীত-বাদ্য-সংলাপ সহযোগে পরিবেশিত হয়। যার চরিত্র সংখ্যা স্বল্প, বিষয় পৌরাণিক বা মানুষের দৈনন্দিন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জীবনের ঘটনা। তার মধ্যে কখনো মিশে থাকে লোকশিক্ষা এবং ‘লোকনাট্য’ হল সেই শিল্পকলা যা গ্রামিণ লোকজীবন ও লোকমননকে প্রভাবিত করে। গাজনপালাগুলি এরকমই একটি লোকনাট্য। বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করে গাজনপালাগুলির সূচনা হলেও কেবলমাত্র ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বর্তমানে এই লোকনাট্যটি সম্পূর্ণ একটি পেশায় পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় দরিদ্র মানুষগুলির সাধ থাকলেও বিনোদন ব্যবস্থার সাধ্য নেই। বিনোদন তাদের কাছে বিলাসবস্তু। গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে নাচ, গান, সংলাপ সমৃদ্ধ গাজনপালাগানগুলি এই নিম্নবর্গীয় দরিদ্র মানুষগুলোর কাছে ছিল বিনোদনের উপকরন। ক্রমশ দিন বদলের সাথে সাথে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্থানে-স্থানে গড়ে ওঠেছে অসংখ্য গাজনদল। যুক্ত হয়েছে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। ধর্মীয় উৎসব থেকে বিযুক্ত হয়ে সপূর্ণরূপে একটি পেশায় পরিণত হয়েছে। যুগ পরিবর্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে বদল ঘটেছে গাজনপালার বিষয়বস্তুতে। দেখা দিয়েছে আধুনিকতা। দৃষ্টিভঙ্গীতে পড়েছে সামাজিক প্রভাব। সম্পূর্ণ দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের অনেকাংশেই স্থান করে নিয়েছে বাস্তব জীবনের ঘটনা। সংলাপ, গান ও ছড়ার মাধ্যমে দেব-দেবীর বন্দনার পাশাপাশি সামাজিক কাজের নানান অসঙ্গতি, দুর্নীতির প্রতি কটাক্ষপাত ছাড়াও নানান সামাজিক

চিন্তাভাবনা এর বিষয়গুলিতে প্রকাশ পায়। ক্রমশ দেবদেবীর পাশাপাশি মানব চরিত্রও স্থান পেয়েছে। তাদের সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক সম্পর্কিত কাহিনি ও সমস্যাগুলি সংলাপ, গান, নৃত্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। প্রথম ছকের বিষয় পৌরাণিক কোন ঘটনার অনুকরণে হয়। দ্বিতীয় ছকটির বিষয় হয় রাধা-কৃষ্ণ প্রেম বা কৃষ্ণকেন্দ্রিক। তৃতীয় ছকটি থেকে শুরু হয় সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক নানান বিষয়ের ঘটনা পরিবেশন। আশেপাশে ঘটমান কোনো বিষয় বা ঐ এলাকাতেই ঘটে যাওয়া কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে নির্মিত হয় এই সকল কাহিনি। চারপাশের চরিত্রগুলি থেকেই নির্বাচন করে নেওয়া হয় কাহিনির চরিত্রদের। এতে গাজনপালাগুলি মানুষের কাছে আরও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। প্রথম ছকটি পৌরাণিক ঘটনাকেন্দ্রিক হওয়ায় তার চরিত্ররাও পৌরাণিক চরিত্রের হন। দ্বিতীয় ছকটির চরিত্ররূপে থাকেন রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই প্রমুখ। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ক্রমানুসারে ছকের ঘটনা অনুযায়ী চরিত্রগুলিকে নির্মান করা হয়। এক একটি দলে ৭ থেকে ৮ টি করে ছক অর্থাৎ কাহিনি পরিবেশন করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ছকটির নামকরণ করা হয়। পুরো পরিবেশনটির একটি নামকরন করা হয়। সৃজনাত্মক পরিবর্তন সম্ভাবনা অর্থাৎ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন বা আশু রচনা হল গাজনপালা লোকনাট্যের ছকগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করে নেওয়া হয় বলে একে অনির্দিষ্ট বলা যায় তাই এর লিখিতরূপ মেলে না। গাজনপালাগুলির সংলাপের ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত। গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক আবেগের প্রকাশ এই সংলাপে নিহিত থাকে। তাই সংলাপগুলি প্রাথমিকভাবে শ্রোতার কাছে সংপ্রেষণের জন্য ঐ অঞ্চলের মানুষের মৌখিক ভাষাকে ব্যবহার করা হয়। লোকনাট্য গাজনপালাতে ভণিতা প্রকাশের রীতির বহুল প্রচলন রয়েছে। ছকের মধ্যে কোনো এক সময় গানের মাধ্যমে কৌশলে বা ভণিতায় পালাকারের নামপ্রকাশ গাজনপালার খুবই প্রচলিত রীতি। লোকনাট্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল জনসচেতনতা বা লোকশিক্ষা। কাহিনির মধ্যে লুকিয়ে থাকা বার্তা দর্শক মনে শিক্ষা বা সচেতনতা বোধ জাগায়। বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জনপ্রিয় গাজনপালার মধ্যে যে সমস্ত ছক পরিবেশন করা হয় তার অধিকাংশ কাহিনির মধ্যে থাকে সামাজিকবার্তা যা দর্শক মনে সচেতনতা বোধ জাগ্রত করে। সেটা কখনো হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক, কখনো আইনগত, কখনো পারিবারিক সচেতনতা। আবার প্রশাসনিক কোনও বার্তাও গাজনের কাহিনির মাধ্যমে গ্রামের এই নিরক্ষর বা স্বল্প সাক্ষরিত, শহর থেকে বহুদূরে বসবাসকারী আধুনিক যোগাযোগ বা সংযোগ মাধ্যমবিহীন মানুষগুলির

কাছে সহজেই তুলে ধরা হয়। প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসকারী অক্ষরবিহীন আধুনিক মাধ্যম থেকে দূরে বসবাসকারী মানুষগুলির কাছে সহজেই কোনও বার্তা বা সচেতনতা পৌঁছে দেওয়ার এক অপরিহার্য মাধ্যম এই গাজনপালা কাহিনিগুলি। এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটি একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রবণ মাধ্যম হওয়ায় মানুষের মনের কাছাকাছি পৌঁছনোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি বিষয় হল এটি পর্দার দৃশ্য নয়। দর্শকের সমক্ষেই যেহেতু পরিবেশন করা হয় তাই দর্শক নিজেকে অনেক বেশি এর সাথে একাত্ম করতে পারে ফলে যে বার্তা সে পায় সেটা অনেক বেশি তার কাছে মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

চতুর্থ অধ্যায়: গাজন লোকনাট্য: আঙ্গিক ও অভিনয় পাঠ্য হিসেবে বিশ্লেষণ

পালা পরিবেশনের আঙ্গিকগত বিন্যাস হয় এরকম—প্রতিটি পালা পরিবেশনে ৭ থেকে ৮টি করে ছক অর্থাৎ কাহিনি থাকে। পরিবেশনটির সময় হয় মোট তিন ঘন্টা। পালাগুলি শুরুর আগে ফাঁকা মঞ্চে ঘণ্টা বাজানো হয় সাজঘর থেকে। একেবারে শুরুতে থাকে 'বন্দনা গান'। দলের আরাধ্য দেবতাকে বন্দনা করার পর প্রথম ছক পরিবেশিত হয়, তারপর হয় 'করাচ গান'। প্রথম ছকের কাহিনিতে যেহেতু অশুভ শক্তির বিনাশ করা হয় তাই করাচ গানের উদ্দেশ্য হল অসুর বধের পর স্বর্গে যেমন আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেখানে দেবতাদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে উর্বশী কিন্নরীরা যেমন নৃত্য পরিবেশন করে তেমনি অভিনেতারা দর্শকদের কাছে আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্যে এই গীতনৃত্য পরিবেশন করেন। এরপর বাকী ছকগুলি পরিবেশন করা হয়। প্রতিটি ছকের মধ্যে থাকে গান। সংলাপের মাঝে মাঝেই গানের ব্যবহার হয়। ছকের শুরুতে যে গান থাকে তাকে বলে 'মুখ গান'। ছকের মধ্যবর্তী অংশে সংলাপ মিশ্রিত দীর্ঘ গান পরিবেশিত হয়, একে বলে 'বডি গান' এবং ছকের একেবারে শেষে যে গান করা হয় তাকে বলা হয় 'ফিনিশিং গান'। গাজনপালার গানে ও সংলাপে পাওয়া যায় আঞ্চলিক প্রভাব। মুখে মুখে রচিত গানগুলিকে কেন্দ্র করে ঘটনা ক্রমে আসরেই সংলাপ রচিত হত। গ্রামেরই কৃষিজীবী শ্রমজীবী নিরক্ষর বা স্বল্প-স্বাক্ষরিত মানুষজন ছিলেন এই সমস্ত গানের সৃষ্টিকর্তা। তবে বর্তমানে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সংযোগের ফলে পেশাদার পালাকার দ্বারা গাজনপালা রচনা করা হয় এবং ক্রয় করা হয়। গানের মাঝে ভণিতায় পালাকার কৌশলে নিজের নাম প্রকাশ করেন। কাহিনির সমস্ত চরিত্রই পুরুষ দ্বারা অভিনীত এই গাজন পালাগুলি সঙ্গীতবহুল এবং নৃত্যেও দেখা যায় বিশেষ ভঙ্গীমা। বর্তমানে

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যে সমস্ত পেশাদারি গাজনদল গড়ে উঠেছে অর্থ যশ, জনপ্রিয়তা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিয়োগ হয়েছে দলের তত্ত্বাবধায়ক, নির্দেশক, পরিচালক, বাদ্যকার, পালাকার, আলোক ও শব্দ নিয়ন্ত্রক এবং আরও নানান সদস্য। ক্রয় করা হচ্ছে পালা। নির্মিত হয় মঞ্চ। দেশীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের সাথে যুক্ত করা হয় আধুনিক, পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র। সাজসজ্জা থেকে প্রসাধন সমস্ত কিছুতেই এই বদল ঘটেছে। বদল ঘটেছে গাজন পালার গানের ভাষায়, সুরে, সংলাপে। বর্তমানে মানুষের রুচি ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পালা নির্মাণ, গানের সুরারোপ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আরো আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা, টিকিটের ব্যবস্থাও হয়। রসাত্মক আবেদন গাজনপালার অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়। যে কোন বিষয়কেই স্থুল হাস্যরসের আঙ্গিকে পরিবেশন এর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রথম ও দ্বিতীয় ছক দুটি পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক আঙ্গিকের হওয়ায় হাস্যরস বিশেষ থাকে না। তৃতীয় ছকটি থেকে এর প্রয়োগ হয়। হাস্যরস কখনও কখনও চটুলও হয়ে ওঠে। সংলাপে বা অঙ্গভাষায় যার প্রকাশ ঘটানো হয়। সমাজের অনেক ব্রাত্য বিষয় অনেক সহজেই সাবলীল ভাবে দর্শক সমক্ষে চটুলতার মোড়কে ধরা দেয়। আঙ্গিক অভিনয়ও নাটকের অঙ্গ। তবে গাজনপালার পরতে পরতে আঙ্গিক অভিনয় থাকলেও কোনো কোনো ছকে আঙ্গিক অভিনয়ের অতিরঞ্জিত উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়। এখন কোনো পূজা বা মেলাকে কেন্দ্র করে বা কেবলমাত্র বিনোদনের জন্যও গাজনপালার আসর বসে। কেবলমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছরই অনুষ্ঠিত হয় গাজনপালার আসর। তাই বলা যায় আজ গাজন কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয় ক্রমে সে নিজেকে লোকনাট্য ও শিল্পচর্চার মাধ্যম রূপেও আত্মপ্রকাশ করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়: গাজন উৎসব ও পালাভিনয়: সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সাম্প্রতিক অবস্থা

বর্তমানে গাজনপালাগুলির বিষয় ও চরিত্রগুলি অনেকাংশেই বাস্তবধর্মী। এর আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিকতাপূর্ণ। তাই সহজেই দর্শককে তা আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে এবং বিষয়বস্তু মানুষের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। বহু বছর ধরে অগণিত মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত গাজনপালাগুলি এবং তার অভিনেতাদের সহজ, সরল, প্রাণের আবেদনময় পরিবেশনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রাম্য নিরক্ষর বা স্বল্প স্বাক্ষরিত মানুষগুলির মনে ও জীবনে এক বিশাল ব্যাপকতায় পক্ষ বিস্তার করে। নৃত্য-গীত মূর্ছনা ও সংলাপে গাঁথা ওই লোক কাহিনিগুলির পরতে পরতে রয়েছে এই সমাজের মানুষের জানা, অজানা,

বাস্তব নানান বিষয়। তাই এই প্রবহমান সংস্কৃতিটি জীবন্ত মনুষ্য সমাজকে উদ্দীপিত করে। চতুর্পার্শ্বের সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয়গুলি অবলম্বন করে নির্মিত পালা কাহিনিগুলিতে নিখাদ হাস্যরস ও রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের সমস্যা, অবক্ষয়িত রূপ, জটিল বিষয় ও অন্ধকারময় দিকগুলিকে গ্রাম্য নিরক্ষর মানুষগুলির সামনে উপস্থাপন করা হয়। যার মাধ্যমে তাদেরকে ঐ বিষয়গুলি দ্বারা প্রভাবিত করা হয় এবং সমস্যাগুলির প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামিণ নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির শিক্ষা ও চেতনায় লোকনাট্য গাজনপালার প্রভাব অপরিহার্য। যুগ যুগ ধরে গ্রামিণ সমাজের পরিবর্তনের সাথে সে নিজেকে ছন্দ মিলিয়ে চলেছে। আজও চলছে। তাই তার বিষয়েও সে প্রভাব প্রতীয়মান। মূলতঃ দেব-দেবীমূলক কাহিনিগুলি তাই আজ অনেক বেশি জীবনকেন্দ্রিক। ধর্মচেতনার পাশাপাশি গোষ্ঠীচেতনা, সংস্কৃতি চেতনা এবং গ্রামজীবনের বাস্তব সমাজ চেতনা সেখানে স্থান পেয়েছে। গাজনপালাগুলির মাধ্যমে পালাকারেরা সমাজ সচেতনতায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সামাজিক নানান মন্দ বিষয়গুলিকে রঙ্গ, ব্যঙ্গ, তামাশা, পরিহাসের মাধ্যমে মনোরঞ্জক উপাদানরূপে গ্রাম্য মানুষগুলির সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে আসলে সমাজের অগ্রসরতার প্রতিবন্ধক দিকগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে নিরক্ষর মানুষগুলিকে সচেতন করে তোলেন। ঈশ্বর উপাসনার মধ্যস্থ ভণ্ডামি, অকর্মণ্য অলস, মাদকাসক্ত স্ত্রীর উপর অত্যাচারী কর্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন স্বামী, সামাজিক বৈষম্য, শ্রেণি বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্যতা, পণের দাবিতে নির্যাতিতা গৃহবধূর মৃত্যু, পরকীয়া প্রেম, সামাজিক নানান অন্ধাকারময় দিক, সমাজ অগ্রসরের প্রতিবন্ধকতা প্রকাশিত হয় পালাকারের রচনায়। নারীও যে প্রকৃতির শিকার হন সেই নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন পালাকারগণ। গাজনপালাগুলির মধ্যে রঙ্গ, তামাশার মাধ্যমে প্রতিবাদ প্রতিরোধের রূপটি প্রকাশ পায়। সামগ্রিক ভাবে পালাকারেরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে শিল্পসম্মত রূপ প্রদান করেন যা প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে নান্দনিকতার জগতে আমাদের উত্তীর্ণ করে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসমাজ এর চর্চা ও দৃষ্টিনন্দনরূপ প্রদান করে দর্শককে মুগ্ধ করে চলেছে, তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় লোকসমাজের সমাজমনস্কতা, সমসাময়িক কাল চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় এই গাজনপালা কাহিনিগুলিতে। কাহিনির মধ্যে প্রকাশ পায় বাবা মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্যহীনতা, অবহেলা, অসম্মান, উদাসীনতা, দাম্পত্য কলহ প্রভৃতি। পারিবারিক, সামাজিক ছকগুলির

ঘটনা প্রেক্ষিতে সেই চিত্র ধরা দেয় দর্শকচক্ষে। লোকসংস্কৃতি আমাদের গ্রামিণ সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সহায়ক শক্তি রূপে কাজ করে। গাজনপালাগুলিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পালাকারেরা যে সৌন্দর্য উৎঘাটিত করেন তা মাতৃভূমির প্রতি তাদের ভালোবাসার উৎসস্বরূপ। এর অভিনয়ের ভাষা এখানকার মানুষেরই প্রচলিত মৌখিক ভাষা ফলে দর্শক মনে তা সহজেই গ্রহণযোগ্য এবং স্থায়ী হয়। তাই ঐ অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির জীবনে এটি সহজেই গণশিক্ষার একটি মাধ্যম হয়ে উঠতে পেরেছে। মনোরঞ্জনের পাশাপাশি এটি গণশিক্ষার একটি বাহন। এছাড়া সঙ্গীত ও নৃত্য সহজেই যেহেতু মানুষের কাছে মনোগ্রাহী হয় তাই আনন্দের পাশাপাশি এগুলি শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠতেও সহায়ক হয়। গাজনপালাগুলিতে হাস্যরস মিশ্রিত বিনোদনমূলক উপাদানের মধ্য দিয়ে সমালোচনা পরিহাস, সচেতনতাবোধ জাগরণের প্রাধান্য বিস্তার করে। স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং অন্যান্য প্রচারমূলক বিষয়ও গাজনপালায় অংশত নিহিত রাখেন পালাকারেরা। পরিবার থেকে সমাজ অতিক্রম করে রাষ্ট্র সমস্ত বিষয়ের জনসচেতনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিক্ষেপ করা হয় গাজনপালার কাহিনিতে। পালাগুলি লোকসাংবাদিকতার কাজও করে। দেশের খবর জানা যায় অনেক সময় কাহিনির মধ্যে দিয়ে। প্রশাসনিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বিষয়, আইনি বিষয়, সরকারি জনসচেতনতামূলক প্রচারের বিষয়গুলিও পালাগুলির মধ্যে ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অগণিত শিল্পী রয়েছেন যারা আপন প্রতিভাবলে ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে গাজন পালাগানগুলি রচনা ও পরিবেশন করেন। তাদের কল্পনা, আদর্শ, জীবনবোধ, ভবিষ্যতের বিকাশপন্থা, তীব্র আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তাদের সৃষ্ট গাজন পালাগানসমুহে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষগুলির কাছে কোনো শিক্ষামূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম এই গাজনপালাগানগুলি। পালাকারেরা এর মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে সমাজ সচেতনতা বোধ জাগ্রত করা, সমাজকে সচেতন করার কাজটি করে চলেছেন।

উপসংহার

দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছে এখন কৃষি নির্ভরশীলতা জীবনের একমাত্র অবলম্বন নয়। মানুষের জীবনেও বেড়েছে গতিশীলতা। মাসব্যাপী শিবের আরাধনায় যাপন করা অনেকের কাছেই এখন অসম্ভব। নতুন প্রজন্মের অনেকের কাছে এই উৎসব এখন আবেগহীন তাই চৈত্র মাসে গাজন উৎসব পালন করা হলেও আগের থেকে উন্মাদনায় ঘাটতি দেখা যায়। বর্তমানে গাজন কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়। সঙ্গীত,

নৃত্য, সংলাপ, অভিনয়ের দ্বারা নির্মিত গাজনপালাগুলি লোকনাট্যও। একসময় যা ছিল ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে একটি মনোরঞ্জনমূলক অংশ বর্তমানে তা রূপান্তরিত হয়েছে সম্পূর্ণ একটি পেশায়। লোকনাট্যরূপ গাজনপালায় এসেছে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য পরিবেশনায় দেখা দিয়েছে পরিবর্তন। একসময়ের কেবলমাত্র দেব-দেবী নির্ভর রচিত গাজনপালা কাহিনিতে বর্তমানে ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক নানা বিষয় নির্ভর কাহিনি। এছাড়া বর্তমানে গাজনপালাগুলিকে ঐ অঞ্চলের সমাজের দর্পণরূপে প্রতিপন্ন করা যায়। পালাগুলির বিষয়ে, কাহিনির পরতে পরতে ধরা দেয় স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, মানসিকতা তাই গাজনপালাগুলি কেবলমাত্র এখানকার লোকনাট্য নয় এগুলিকে এখানকার মানুষের অন্দরের এমনকি অন্তরের প্রতিরূপ বলা যায়। গাজনপালাগুলির গানের কথায়-সুরেও দেখা দিয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। পালাগুলির নামকরণে, সংলাপের ধরনে, নৃত্যভঙ্গিমায় যেমন পাওয়া যায় আধুনিকতার প্রভাব তেমনি আবার সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিকতার স্পষ্টরূপ ধরা দেয়। যা আবার লোকনাট্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আসলে সময়ের সাথে সাথে বিষয় বৈচিত্র্যে নানান পরিবর্তন দেখা দিলেও গ্রামের মানুষের অন্ধবিশ্বাস, পুরাণ, কৃত্য ('রিচুয়াল') দ্বারা মূলত মৌখিকভাবে রচিত নাট্যধর্মী এই গাজনপালাগুলি আজও লোকনাট্যের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলিকে বহন করে চলেছে। আসলে আধুনিকতার স্পর্শে পরিবর্তন স্বাভাবিক। দিন বদলের ধারায় পরিবর্তন ঘটিয়ে সে নিজেকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে এবং এখনও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গের মানুষের কাছে এক বিশেষ মনোরঞ্জনের উপাদান হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে আছে। বর্তমান সময়ে সুদূর গ্রাম-গঞ্জেও একাধিক আধুনিক মনোরঞ্জনের উপাদান থাকা সত্ত্বেও মানুষ আজও গাজনপালা উপভোগ করেন। এই পালা যেন তাদেরই ঘরের কথা বলে, তাদের জীবনের প্রেক্ষাপটেই নির্মিত তাদেরই জীবনের দর্পণ তাই হরেক মনোরঞ্জনের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও গাজনপালার প্রতি আজও শিকড়ের টান অনুভব করেন এখানকার অধিবাসীরা।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর পাঠ

সংগৃহীত গাজন পালা

'অভিশপ্ত আতঙ্ক', রচনা- ড. জগন্নাথ গায়েন, নির্দেশনা- কানাই হালদার ও কুমার মিঠু (আদি পঞ্চানন গাজনতীর্থ, ৩.১২.২০১৭)

'মৃত্যু শয্যায় বিয়ের বাসর', রচনা- জগন্নাথ গায়েন ও অশ্বিনী নাইয়া, নির্দেশনা- লখিন্দর পণ্ডিত ও অশ্বিনী নাইয়া (নিউ দিগ্বিজয়ী অপেরা, ৬.১২.২০১৭)

'বর কেন যাযাবর', রচনা- বাবলু হালদার ও সম্রাট নাইয়া, নির্দেশনা- যুধিষ্টির হালদার (নিউ নট্ট কোম্পানী, ৭.১২.২০১৭)

'ঘুম পাড়ানী পরীর দেশ', রচনা- মাষ্টার গৌর চন্দ্র নস্কর, নির্দেশনা- বিশ্বনাথ দাস (আদি মুক্তাঙ্গন গাজন সংস্থা, ১০.১২.২০১৭)

'মরনলগ্নে মিলন সানাই', রচনা- মাষ্টার স্বপন গায়েন, নির্দেশনা- পাঁচু গোপাল হালদার (দি পঞ্চানন গাজনতীর্থ, ১৩.১২.২০১৭)

'কর্মের শেষ পর্বে ভালোবেসে কি পেলাম', রচনা- মহাদেব শিকারী, নির্দেশনা- নরেশ অধিকারী, (আদি শিবিশক্তি গাজনতীর্থ, ১৮.১২.২০১৭)

'বিধবার গায়ে হলুদ', রচনা ও নির্দেশনা- হরিসাধন মণ্ডল (দি নাট্যমঞ্জরী গাজনতীর্থ, ২১.১২.২০১৭)

'রক্ত পিপাসু কালোছায়া', রচনা- মাষ্টার রামকৃষ্ণ বৈদ্য, নির্দেশনা- সমীর হালদার (নাট্য মন্দির গাজনতীর্থ, ২৩.১২.২০১৭)

'ক্ষুধার্ত চায় লালরক্ত', রচনা- মাষ্টার স্বপন গায়েন, নির্দেশনা- অশ্বিনী নাইয়া (নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা, ২৫.১২.২০১৭)

'মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম', রচনা- রামকৃষ্ণ বৈদ্য, নির্দেশনা- প্রফুল্ল সরদার (শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা, ২৭.১২.২০১৭)

পৃথিবী আজও কাঁদে', রচনা- মহাদেব শিকারী, নির্দেশনা- নরেশ অধিকারী, (আদি শিবিশক্তি গাজনতীর্থ, ১৫.১১.২০১৮)

'অহংকারী রাধা', রচনা- নরেশ অধিকারী, নির্দেশনা- অশ্বিনী নাইয়া (নাট্য মন্দির গাজনতীর্থ, ১৮.১১.২০১৮)

'এক দিনের মুখ্যমন্ত্রী', রচনা- মাষ্টার গৌর চন্দ্র নস্কর, নির্দেশনা- বিশ্বনাথ দাস (আদি মুক্তাঙ্গন গাজন সংস্থা, ২০.১১.২০১৮)

'স্বামী যাচ্ছে জেলে', রচনা- মহাদেব শিকারী, নির্দেশনা- নরেশ অধিকারী, (আদি শিবিশক্তি গাজনতীর্থ, ২৫.১২.২০১৯)

‘আমার ঠিকানা জেলখানা’, রচনা- নরেশ অধিকারী, নির্দেশনা- অশ্বিনী নাইয়া (নাট্য মন্দির গাজনতীর্থ, ২৮.১২.২০১৯)

‘অয়নের শয়নকক্ষ’, রচনা- মাষ্টার স্বপন গায়েন, নির্দেশনা- অশ্বিনী নাইয়া (নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা, ৩০.১২.২০১৯)

‘আঁচলে বাঁধা আলো’ রচনা-মাষ্টার গৌর চন্দ্র নস্কর, নির্দেশনা- সমীর হালদার (নাট্য মঞ্জরী গাজন সংস্থা, ৩১.১২.২০১৯)

সাক্ষাৎকার

০৩.১২.২০১৭-৩১.১২.২০১৯ তারিখের মধ্যে উক্ত দলগুলির অভিনেতা, বাদ্যকার, তত্ত্বাবধায়ক, আহ্বায়ক, নায়েব, সহায়ক শিল্পীদের সাক্ষাৎকার (পরিশিষ্ট-১-এ দ্রষ্টব্য)

বৈদ্যুতিন মাধ্যমের গাজন পালা

https://www.youtube.com/watch?v=Wiofb4-TpsU

https://youtu.be/48t56LetukA?si=GMz_DpL2ECJbbPEw

https://youtu.be/tP3GdywUQSI?si=6d37NfAH2XyoO_gm

https://youtu.be/Exk1o7qIgf4?si=TjPndtsdF3ft5cWT

https://youtu.be/fiiAnijviik?si=I2xW7Vjyn1OKBoO4

https://youtu.be/ZGDpu9xI3PM?si=BQI5cCmhyIHjEHw3

https://youtu.be/93_5vL8u1Jg?si=rp9S0cRNd8BONPLl

https://youtu.be/8DAaeOslHss?si=qxK32_F2Sc9MvXNN

https://youtu.be/T-47FJ3Jhbs?si=7mu2EWWxojW041Aa

https://youtu.be/jhY79RTAifc?si=3OMnPLOOYQmO_40V

https://youtu.be/2-JmbRIZl1c?si=BZH1h1jNuJfH8mZV

https://youtu.be/8DAaeOslHss?si=U8jFyum0AhwoxbTH

https://youtu.be/TMH4ScYpKDo?si=RdzOZRS3tDlysMR4

https://youtu.be/W7w2Lu2xkfQ?si=nlDa4m6xrNVD5vZI

https://youtu.be/54QpQVdcZm8?si=Nm6B-dPMalCOyiBy

https://youtu.be/MJ_wg4kBCZ0?si=rYNr-iApjeBKdn2e

https://youtu.be/93_5vL8u1Jg?si=guVDqcKjov8zmQGd

https://youtu.be/0l7QKjd_jYA?si=mGVlgEAfdibGm4cr

https://youtu.be/Dp1-VbgSdi4?si=VjtEGe9fK7fK-zHF

https://youtu.be/RFsrdbl8TvU?si=VIpeOSznDsn_5T5a

https://youtu.be/0G3lLyA5mf0?si=8IXc0xOz44aRr2gP

https://youtu.be/QB4Watw44W4?si=5n8GDknyJ-2hJl6P

https://youtu.be/QB4Watw44W4?si=5-MPMFi7dCiT1zU5

https://youtu.be/hOu9eXWop5c?si=sBY6muE4qaMUHvA2

https://youtu.be/8cBHYplGhMU?si=tTFMTP1dnacJAl8R

https://youtu.be/xwk2lbMmWxA?si=FyLnWPm8BGf98_VH

https://youtu.be/Exk1o7qIgf4?si=fZGcNALf6Ygzlz2V

https://youtu.be/-Hj5BO_hZWA?si=MqHy-Fp7kx_pPA1H

https://youtu.be/ZGDpu9xI3PM?si=u-ZZOf1ZXOn08gAR

গবেষণা পত্র

হালদার, পীযূষ কান্তি।*চব্বিশ পরগনার গাজনপালা আঙ্গিক, বিষয় ও লোকশিক্ষা*। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, (এম.ফিল), তত্ত্বাবধায়কঃ ড. সুজিত কুমার মণ্ডল, ২০১৪।

গ্রন্থ

ছাটুই, তুহিনময়।*গাজন তলার গান*। কলকাতা: যুবদর্পণ পত্রিকা, ১৯৯৪।

নস্কর, দেবব্রত। *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালা গান ও লোক সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৯।

নস্কর, ধূর্জটি। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গাজন ও গাজনমেলা*। ডায়মণ্ডহারবার: আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ গ্রাপস প্রিন্টিংস, প্রথম প্রকাশ ২৬ চৈত্র ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।

সমাদ্দার, রণজিৎ কুমার। *চড়ক গাজন (প্রবন্ধ)*। কলকাতা: ভারতকথা, ১৯৮৬।

হালদার, বিমলেন্দু। *দক্ষিণ ২৪ পরগণা যাত্রাগান: ইতিহাস ও আলোচনা (প্রথম খণ্ড)*। সোনারপুর: প্রিয়নাথ প্রকাশনী, ২০১১।

হালদার, বিশ্বজিৎ। *লোক-ঐতিহ্যের ধারায় দুই ২৪ পরগণার শিবসংস্কৃতি: চড়ক, ধর্মদেল, গাজন ও বালাগান*। কলকাতা: তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।

সহায়ক পাঠ

অধিকারী, ইন্দুভূষণ। *লোকধর্ম অতীত ও বর্তমান*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০১০।

আহমেদ, আফসার। *গাজীর গান: শিল্পরীতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

আহমেদ, রাজিব (সম্পা.)। *সুন্দরবনের ইতিহাস: ১ম-২য় খণ্ড*। ঢাকা: গতিধারা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১২।

ইসলাম, মধু (সম্পা.)। *শিল্প-সাহিত্যে সুন্দরবন*। ঢাকা: সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার, প্রথম প্রকাশ: ২০০২।

ইসলাম, রফিকুল। *সুন্দরবনের সেই সব কথা*। ঢাকা: এলিট পাবলিশার্স, ১৯৯৮।

ইসলাম, শেখ রেজওয়ানুল। *সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন ও ঐতিহ্য*। ঢাকা: সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০১৩।

চক্রবর্তী, তপন। *বাংলাদেশের বন ও বনানী*। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৯।

চক্রবর্তী, তারাপদ। *পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় স্থাপত্য: মন্দির ও মসজিদ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮।

চক্রবর্তী, রঞ্জন ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী। *সুন্দরবনের অর্থনীতি,* জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ। কলকাতা: রিডার্স সার্ভিস, ২০০৭।

চট্টোপাধ্যায়, অর্ঘ্য চন্দন (সম্পা.)। *জটার দেউল-এর ইতিবৃত্ত*। রায়দিঘি: জটার দেউল সংস্কৃতি সংঘ, ২০১২।

চট্টোপাধ্যায়, সাগর। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলার পুরাকীর্তি*। কলকাতা: প্রত্ন ও সংগ্রহালয় অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

জলিল, এ.এফ.এম আব্দুল। *সুন্দরবনের ইতিহাস*। ঢাকা: আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৬।

দত্ত, কালিদাস। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীত (১ ও ২ খণ্ড)*। বারুইপুর: সুন্দরবন সংগ্রহশালা, ১৯৮৯।

দত্ত, কালিদাস। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিহাস ও উপাদান*। বারুইপুর: কালিদার দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা, ১৯৯১।

দত্ত, গুরুসদয়। *বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য*। কলকাতা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ: মে ২০০৮।

দত্ত, সৌমেন। *প্রেক্ষাপট সুন্দরবন*। কলকাতা: আজকাল, প্রথম প্রকাশ: ২০১০।

নস্কর, ধূর্জটি। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শৈব তীর্থ* কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ১৪০৭।

নস্কর, ধূর্জটি। *বাদাবনের বংশধর* । দক্ষিণ বরাশত, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা: দেবলা প্রকাশনী, প্রথম মুদ্রণ ২৬ জানুয়ারি ২০১৬।

নস্কর, সনৎকুমার ও ছন্দা রায়। *সুন্দরবনের প্রান্তিকজীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ২য় খণ্ড। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

নাথ, সঞ্জীব। *বাংলার লোকনাট্য: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৩।

নাহা, দিলীপকুমার। *প্রান্ত সুন্দরবনের কথ্যভাষা*। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: ২০০০।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোকসংস্কৃতি* । নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট অফ ইন্ডিয়া, ২০১৪।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম সংস্করণ: ২০০৪।

মজুমদার, তুলিকা। *বাংলার বনদেবতা*। কলকাতা: করুণাময়ী পাবলিশার্স, ২০০৭।

মজুমদার, নীহার। *এবং বাংলার লৌকিক জলযান*। কলকাতা: আত্মজা, ২০১৭।

মণ্ডল, নিরঞ্জন। *সাগরদ্বীপের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: কগনিশ্‌ন পাবলিকেশন, ২০১৮।

মণ্ডল, প্রবীর। *আমার সুন্দরবন*। কলকাতা: রূপকথা, ২০১৬।

মণ্ডল, বরেন্দু। *সুন্দরবন ও আমাদের কথা*। কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৫।

মণ্ডল, সুজিতকুমার (সম্পা.)। *বনবিবির পালা*। কলকাতা: গাঙচিল, ২০১০।

মণ্ডল, স্বপনকুমার। *সুন্দরবন: ভ্রমণ বৃত্তান্ত*। কলকাতা: কথা, ২০১১।

মান্না, অনির্বাণ। *লোকজ উপাদান: নব্বই ও পরবর্তী কবিতায়*। কলকাতা: এস এস প্রিন্টার্স, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৫।

মিত্র, অশোক। *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (৩য় খণ্ড)*। দিল্লি: গভ: অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, ১৯৯১।

মিত্র, শান্তনু ও সায়ন্তনী সাউ। *সুন্দরবনের জল কাদার প্রাণি*। কলকাতা: বই কারিগর, ২০১৮।

মিত্র, শিবশঙ্কর। *সুন্দরবন সমগ্র*। কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯৫।

মিত্র, সনৎ কুমার। *পশ্চিমবঙ্গের লোকবাদ্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ: ২৩শে মার্চ ১৯৮৫।

মিদ্যা, বিকাশকান্তি। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্থাননাম*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০১০।

মিস্ত্রী, সুভাষ। *লোকায়ত সুন্দরবন (১ম খণ্ড-৩য় খণ্ড)*। সোনারপুর: লোক প্রকাশন, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৬।

মিস্ত্রী, সুভাষ। *লোকায়ত সুন্দরবন* । কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৪।

সিং, সুকুমার। *দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ইতিহাস (একখণ্ডে)*। কলকাতা: মাস এন্টারটেনমেন্ট প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ: ২০১০।

হালদার, বিমলেন্দু। *দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা (১ম খণ্ড)*। কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারী ২০০১ মাঘ ১৪০৭।

হালদার, বিমলেন্দু। *দক্ষিণবঙ্গের জনসংস্কৃতির কথা ও ইতিহাস বিচিত্রা*, প্রথম খণ্ড। কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ২০০১।

হোসেন, মোঃ মোশাররফ। *সুন্দরবন: বৈচিত্র্যের অপর নাম*। ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৬।

ইংরেজি গ্রন্থ

Bandopadhyay, Alapan & Anup Matilal (Indited). *The Philosopher's Stone: Speeches and writings of Sir Daniel Hamilton*. Gosaba: Sir Daniel Hamilton Estate Trust, 2003.

Banerjee, Anuradha. *Population and Human Settlement of Sundarban Delta*, New Delhi: Concept Publishing, 1998.

Chatterjee, Sisir (Editor). *Community Awareness in Sundarban*. Kolkata: Abc Publication, 2012.

Chattopadhyay, Haraprasad. *The Mystery of the Sundarban*, Kolkata: A. Mukherjee & Co. Pvt. Lt, 1998.

Chowdhury, Tanmay. *The Sundarbans*, Kolkata: Charchapada, 2012.

Curtis, S. J.. *Working Plan for the Forests of the Sundarbans Division*. Kolkata: Bengal Gov.. Press, 1933.

Das, Gautam Kumar. *Sundarbans environment and ecosystem*, Kolkata: Sarat Book Distributors, 2006.

De, Rathindranath. *The Sundarbans*, London: Oxford University Press, 1990.

Dey, Satyendralal and Amal Kanti Bhattacharyya. *The Refugee Settlement in the Sundarbans*. Kolkata: W.B: Socio-economics Study, 2012.

Ghosh, Priyanka. *Impact of Biodiversity Conservation on rural livelihoods in and around the Sundarban tiger reserve (STR): A case study of struggles over access to forest-based resources*. New Delhi: Nehru memorial museum and library, 2013.

Guha, Chandan & Surabhi Bakshi. *Mangrove Swamps of the Sundarbans: An Ecological Perspective*, Kolkata: Naya Prakash, 1987.

Jalis, Annu. *Forest of Tigers: People Politics and Environment in the Sundarbans*. New York: Routledge, 2010.

Kutub Uddin, H.M.. *Impact of Natural Calamities, on Agriculture, Reclaimed Land of Sundarbans (Vol. I)*, Kolkata: Abc Publication, 2013.

Pramanik, S.K.. *Fisherman Community of Coastal Villages of West Bengal*. Jaipur: D.K. Publishers, 1993.

Sharma, Prashant Kumar. *The Impact of Climate Change on Sundarbans*, New Delhi: Adroit Publishers, 2018.

Sobhrajani, Manisha. *Forest of Tides: The Untold story of Sundarban*. London: Hachette, 2018.

Talukdar, J. & M. Ahmed (Eds). *The April Disaster: Study on Cyclone: Affected Region in Bangladesh*. Dhaka: Community Development Library, 1992.

পত্র-পত্রিকা

কপাট, সন্দীপকুমার। “শৌখিন যাত্রার আসর”। *গ্রামীণ পুঁথি*, শারদ সংখ্যা (অক্টোবর, ২০১৪): ৪৩-৪৬

খাস্তগীর, আশিস। “ধ্বন্যাত্মক শব্দে বাংলার লোকজীবন”। *বলাকা*, ৩৬ সংখ্যা (২৭ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮): ৩৫-৩৯

গঙ্গোপাধ্যায়, মদনমোহন। “লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে”। *পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (৭ম বর্ষ, অক্টোবর, ১৯৮৮): ১-৩

চক্রবর্তী, অমরকৃষ্ণ। “হিন্দুনামের উৎস”। *গঙ্গারিডি গবেষণা পত্রিকা,* গঙ্গাসাগর সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭): ১৬-১৮

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার। “লোকসংস্কৃতির চর্চা করব কেন?”। *বলাকা,* ৩৬ সংখ্যা (২৭ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮): ৮-২৩

চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন। “ভালো যাত্রা নাটকের অভাব কেন” *গ্রামীণ পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (অক্টোবর, ২০১৪): ৭-১১

দাস, সত্যব্রত। “শ্যামপুরের যাত্রা ও যাত্রাশিল্পী”। *গ্রামীণ পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (অক্টোবর, ২০১৪): ৪৭-৫৫

দে, ব্রজেন্দ্রকুমার। “যাত্রাপালার পটপরবর্তন”। *গ্রামীণ পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (অক্টোবর, ২০১৪): ১২-১৫

দেওয়ানজি, মলয়। “সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে”। *পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (৭ম বর্ষ, অক্টোবর, ১৯৮৮): ২৫-৩৫

নস্কর, ধূর্জটি। “সুন্দরবনের স্থাননামঃ সাগর”। *গঙ্গারিডি গবেষণা পত্রিকা,* গ্রীষ্ম সংখ্যা (মে-জুন,১৯৯৯): ৪৫-৫৭

নাথ, সৌমেন। “কলকাতায় ধর্মঠাকুরের মন্দির”। *কৌলাল* (৭ম বর্ষ, ডিসেম্বর, ২০১৭): ৬১-৬৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান। “লোক সাহিত্যে নৃতাত্ত্বিক উপাদান: অনুসন্ধানের উপক্রমণিকা”। *বলাকা,* ৩৬ সংখ্যা (২৭ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮): ৪০-৪৬

রায়, পুষ্পজিৎ। “রাজ্যের লোকশিল্পীরা রুষ্ট ক্ষুব্ধ”। *গ্রামীণ পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (৩১তম বর্ষ, অক্টোবর, ২০১২): ১০৭-১০৯

রায়, বুদ্ধদেব। “গাজন উৎসব ও গান”। *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় পত্রিকা* (২য় বর্ষ, ডিসেম্বর ১৯৮১): ৭৫-৮৩

সরকার, রেবতীমোহন। “সংস্কৃতি: মানব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে”। *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* সংখ্যা- ২ (১৯ বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৬): ২১৩-২২৩

হালদার, গৌতম। “সুন্দরবনের কথা”। *গঙ্গারিডি গবেষণা পত্রিকা,* গঙ্গাসাগর সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭): ১৫-১৭

হালদার, নারায়ণ। “লোকভাষা কি এবং কেন?”। *বলাকা,* ৩৬ সংখ্যা (২৭ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮): ৩০-৩৪

আন্তর্জাল সহায়ক-সূত্র

https://en.wikipedia.org/wiki/Pashupati_seal

https://www.himalayanart.org/items/65664

https://www.google.co.in/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=OKrkWsy uBYyMvQTXm7s g&q=goddess++janguli&oq=goddess++janguli&gs_l=psy-ab.12...97365.100875.0.102493.15.14.0.0.0.0.502.2351.0j1j4j2j0j1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab.9.2.703...0j0i67k1.0.bMYKDteOHog.

https://www.google.co.in/search?q=goddess+ekjata&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ved=0ahUKEwjO i-X7uN3aAhVDNI8KHC5lBwkQ_AUICygC&biw=1366&bih=662

https://www.google.co.in/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=xqnkWpr SBYb4vATZ- paoCg&q=goddess++shashthi&oq goddess++shashthi&gs_l=pab.12..0.3930.10323.0.11871.20.17.0.2.2.0.4 02.2829. 3j1j5j3j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.9.1279...0167k1j0i8i10i30k1j0i24k1.0.Fm06e56cfls

https://www.google.co.in/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=xKnk WqHJBcvdvgTH-qqlAg&q=goddess++parnashabari&oq=goddess++parnashabari&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.1100.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0...0.QPPFOhoG76Y